নাগরিক আততি

শুভঙ্কর ঘোষ

নাগরিক

মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি

আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন !

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে ;
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি---
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে গেয়া পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে,
চারদিকে অন্ধকার - রাতের ঝাপসা গন্ধ
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোনো দ্বীপ থেকে,
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধোঁয়াটে-সবুজ জল,
যেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত

আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন---

সমর সেন (১৯১৬)। জন্ম কলকাতায়। সম্পাদনা করেন 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা, তিন পুষ ইত্যাদি।

যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য,
পায়ে চলার পথের শেষে কান্নার শব্দ।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী !
দ্ধ্বাস রাত্রি শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন

আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!

যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে---
স্কুল আর কলেজ হল শেষ, ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন,
দশটা - পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামল
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
কলেরা আর কলের বাঁশি আতর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

সন্ধ্যার সময়,
রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি
চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।

সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন, 'নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন ; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ পর্যন্ত খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো - কোনো আধুনিক কবিতায় থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগর জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়ল। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি,আমাদের আজক

ালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহরের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।' (সমর সেন কয়েকটি কবিতা, লেখার ইস্কুল)। পূর্বজ কবির এই মন্তব্যে সকলেই যে সহমত পোষণ করবেন, এমন নয়। কিন্তু কবি সমর সেনকে অনেকে, এই সূত্রেই নয়, তাঁর কাব্যকর্ম সূত্রে, নাগরিক কবি, নাগরিক চেতনার কবি, মধ্যবিত্ত চৈতন্যের কবি, মধ্যবিত্ত নাগরিকতার কবি ব'লে অভিহিত করায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

উপনিবেশের সমাজে, কলকাতায়, বেড়ে ওঠা, সমর সেন যে নগরজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছেন, পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন বা পিতা অণচন্দ্র সেন সেই একই অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন ছিলেন তা বলা যায় না। সমর সেনের কবি রূপে অ াত্মপ্রকাশের কাল অস্থিরতার কাল, সংকটের কাল। সভ্যতার সংকট তো বটেই, সংকট মানবচৈতন্যের ; সংকট অর্থনীতির ; সংকট সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের, আধিপত্য কায়েমের ; অত্যাচার, যন্ত্রণা ওঅবিশ্বাসের । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমায় যাঁর জন্ম, যিনি কিশোর কালে লক্ষ করেন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট,যিনি স্কটিশচার্চ কলেজে পড়েন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে, পাঠ্য করেন বিশ্বসাহিত্য, প্রত্যক্ষ করেন রবীন্দ্রমনীষার বহুমাত্রিক সৃজনশীলতা, আয়ত্ত করেন এই বিশ্বপথিকের মননচর্চার গতিপ্রকৃতি তাঁর ভাবনার জগৎ বা মননের জগৎ ছিন্নমূল হতে পারে না, হয়ে ওঠে ঐতিহ্য নিষিক্ত। অথচ তিনি স্ব-শ্রেণীর, মধ্যবিত্ত গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেও রবীন্দ্রনাথে আচ্ছন্ন হন না, কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেন কৌতুকে, সময়ের অন্তর্গত বিরোধ বোঝানোয়, কখনো বা কোনো বোধের আপত্তিতে, মধ্যবিত্তের দ্বৈততায়। আত্মযন্ত্রণায় আর্ত, সময়ের ও সমাজের দ্বান্দ্বিকতায় রক্তাক্ত, আত্মসচেতন সমর সেন ৬২ বছর বয়সে পৌঁছে কবুল করেছিলেন, আমার গণ্ডীর সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি।' (বাবু বৃত্তান্ত)। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তঁ ার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল না। নিজেকে বিপ্লবীভাবেন নি কখনো, তাঁর 'পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত।' এই মধ্যবিত্তের অ াততি বা টেনশন তাঁর কবিতায় বারে বারে ফুটে ওঠে, যেমন 'নাগরিক' কবিতায়।

সমর সেনের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর কবিতা রচনায় আয়ু মাত্র বারো বছর ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, তিনি বলেন, 'অর্থাৎ আমার আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত।' এত অল্প সময়কাল-অথচ এত বিতর্কিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি ব্যক্তিত্ব বাংলা কাব্যক্ষেত্রে বিরল। এই বারো বছরে তিনি লিখেছেন 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০) 'নানা কথা' (১৯৪২) 'খোলাচিঠি' (১৯৪৩) 'তিন পুষ' (১৯৪৪)। পাঁচটি গ্রন্থের মোট ১০৬টি কবিতা নিয়ে তাঁর কাব্যভাণ্ডার। আর এই সূত্রেই আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তিনি চিরকালের আসনটি আদায় করেছেন। নিছক ঐতিহাসিক মূল্যেই তাঁর কাব্যসমূহ গুত্বপূর্ণ নয়, সাহিত্যচি ও সাহিত্যবীক্ষার সঙ্গে তাঁর জীবনবীক্ষার সূত্র সন্ধানেও অতীব স্বতন্ত্র। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত 'সমর সেনের কবিতা,' গ্রন্থে অবশ্য ৭৮ কবিতায়তাঁর নির্বাচন - চিও প্রতিফলিত হয়েছে।

সমর সেনের 'নাগরিক' কবিতা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'র অন্তর্গত। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ -এর মধ্যে লেখা কবিতাগুলির সংকলনে শুধু 'নাগরিক' নয়, অন্যান্য কবিতার মধ্য দিয়ে এই কবিকে, কবির দেশকালকে ধরা যায়, তাঁকে চেনা যায়, তিনি কোন সময়ের কবি, কেন তাঁর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অন্যরকম, কেন বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের প্রতি তুলনায় 'কয়েকটি কবিতা'কে 'কালপ্রভাবে বেশি আধুনিক' বলে দাবি করেন। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তখন অ ালোড়িত হলেও অনেকেই ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশেই নয়, একটি নিটোল মূল্যায়নে উৎসাহিত হয়েছিলেন, যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসু। ধূর্জটিপ্রসাদ মন্তব্য করেছিলেন, সমর সেন A Modern Poet, but not progressive. বলেছিলেন এইভাবে, 'Samar Sen is an up-t-date representative Poet. He needs to be progressive by informing himself with a sense of He has also yet to be symbolic. Still there is no doubt of his being a poet of a Particular genre.' (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ জুন) একটু দীর্ঘ হলেও বিষ্ণু দে-র ব্যাখ্যা খোনে উদ্ধৃত করা যায়, 'ব্যক্তিস্বরূপের কি কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সংগতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এই সৎ কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তাঁর মধ্যে এই শ্রেণিবিরোধের ব্যথা গোপনই আছে -- কারণ তাঁর নিজের

কবিপরিণতি আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ - ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হয়ে উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ কবির কাছে যে বেগে আসতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মার্কস এবং প্লেখানভের অনুমোদন কবিরই পক্ষে, শিষ্যেরা যাই বলুন।' (পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৪)। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন, 'সমর সেনের রচনায় একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে আমি দেখলুম, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।' (কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৪)। বস্তুত এঁদের বিভিন্নতাই সমর সেনের কবিত্বশক্তির গভীরতা ও ব্যাপ্তিকেই স্বীকৃতি দেয়।

মুশকিল হচ্ছে, সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' পড়েই আমাদের যদি মনে হয়, 'তিনি মুখ্যত নাগগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের কবি' (জগদীশ ভট্টাচার্য , আমার কালের কয়েকজন কবি', 'সমর সেন') তাহলে বোধ হয় একমাত্রিকতায় আচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিকই এই 'নাগরিক' রচয়িতা'র কলমেই লিখিত হয়েছে 'আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে/ বনিক সভ্যতার এই শূন্য মভূমি' (একটি বেকার প্রেমিকা), 'আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে/ কত শথাব্দীর শূন্য মভূমি (পোস্ট গ্রাজুয়েট, ১৯৩৭) কিংবা 'চাঁদের আলোয় / সময়ের শূন্য মভূমি।' (মভূমিতে মৃত্যু) 'হাহাকার' কিংবা 'ধূসর' তাঁর কবিতায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত শব্দ। তাঁর ৪৯টি কবিতা সম্বলিত 'কয়েকটি কবিতা'-য় লক্ষ করি যৌনতা, ক্ষয় অন্ধকার, পাথর, বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি, আর্তনাদ, শূন্যতার ইঙ্গিত, নির্দেশ, উচ্চারণ বা উল্লেখ। আসলে তা ছিল আততির কাল। ১৯৩৪ - ৩৭ - এর কবিতা সমূহের সংকলন 'কয়েকটি কবিতা' বলেই, অশ্রুকুমার সিকদার বোঝাতে চান '১৯৩৪-৩৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ের কবিতাবলীর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক সামাজিক প্রোগ্রাম নেই, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো কার্যত্রম নেই, সেই পর্যায়ে শুধু অনির্দেশ্য ব্যর্থতার হাহাকার, ত্রন্দন, দুঃস্বপ্ন ও বিষণ্ণতা' (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়)। তঁার এই প্রথম দিককার কবিতায়, কেন এরকম ঘটেছে,কেন এত অন্ধকার, সমর সেন বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তাই কী অশ্রুকুমার আমাদের জানতে চান, 'কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষগোচর যুক্তিভিত্তিক কারণের প্রতি নির্দেশ না করায় সেই অনির্দেশ্য কারণ দুঃস্বপ্নের কবিতার মধ্যে ভাষা পেয়েছে যেন সভ্যতার দীর্ঘশ্বাস, সার্বভৌম হাহাকার -- অভিজ্ঞতাপ্রধান যৌবনের বেদনা, ব্যর্থপ্রণয়ের যন্ত্রণা এবং পরিবেশজনিত জুগুপ্সা। ব্যক্তিগত হাহাকারে স্বর পেয়েছে সভ্যতার আর্তনাদ।'

সমগ্র সমর সেনকে মনে রেখে তাঁকে 'সাম্যবাদী কবি' বলে অভিহিত করার প্রবণতা জাগে। সমাজতন্ত্রের পাঠ তাঁর ছিল। তাঁর জীবনের উত্তরপর্ব এ ব্যপারে জোরালো সাক্ষ্য দেয়। তবে তাঁর ১০৬টি কবিতার সাধারণ উপাদানগুলি ওবিশেষ প্রবণতা মনে রেখে হয়তো তাঁকে এ ভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু তিনি যে কেবল অন্ধকার দেখেন, নৈরাশ্য দেখেন, বিবমিষা দেখেন, সমাজতন্ত্র বা সুন্দরের স্বপ্ন দেখেন না, তা নয়। এই আবিষ্কারই আমরা 'নাগরিক' কবিতাই দেখব। তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছিলেন, সে অভিজ্ঞতাও কার্যকর হয়েছে তাঁর কবিতায়। অন্যত্র তিনিই লিখেছিলেন, 'জীবন ধারার চাপ চেতনাকে গড়ে / চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।' অবশ্য অন্নদাশঙ্কর রায় এই উক্তিতে কেতাবী মার্কসবাদের ইঙ্গিত পেয়ে ঠাট্টা করে জানিয়েছিলেন, শ্রীমান সমরেন্দ্র সেন / লিখেছেন, যা পড়েছেন। / শ্রীমান সমরেন্দ্র সেন / পড়েছেন, যা লিখেছেন।'

তবু কবি সমর সেনের আততি, আধুমিক কবিতারই আততি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, শ বিপ্লব, ১৯২৯ - এর অর্থনৈতিক মন্দা, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান ও আগ্রাসন, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, মানুষে মানুষে একতা -- সর্বস্তরে, সময়ে সময়ে, সময়ান্তরে আততির পর আততি। 'নাগরিক' এরকমই আততির ফসল ; ১৯৩৪ - ৩৭ -এর অগ্নিগর্ভ, অস্থির, অনিকেত সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান মধ্যবিত্তের কূপমণ্ডুকতা ও বদ্ধতা অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব কিছুরই প্রকাশ 'নাগরিক' কবিতায়। ৫১ পংক্তি বিশিষ্ট এই কবিতায় শুধু কী ক্ষয়, অন্ধকার, গ্লানি ও হতাশা উচচারিত, মনে হয় না। 'নাগরিক' কবিতা কী নাগরিক মনের বা জীবনের কবিতা? বা কোনো নাগরিকের কথামালা --- ব্যথা, বিষাদ ও যন্ত্রণালেখ্য' এ নাগরিক জীবন কী কলকাতা শহরের জীবন? এ জীবন কী মধ্যবিত্তের কথা বলছে, মধ্যবিত্ত জীবনের মর্মবস্তুর বৈপ্লবিকতার সম্ভাবনা বা প্রত্যাশার কথা বলছে না? সমর সেন কী এই শ্রেণির অন্তর্গত হয়েও এদের পক্ষে কথা বলছেন? একই কলকাতার মধ্যে দুটি বিপরীত পৃথিবীর সন্ধান পাচ্ছেন কী? নাকি, এত কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েও বলা যাবে,

অশ্রুকুমারেরর মতন, 'সমর সেন শহরের কবি, কিন্তু যেকোনো শহরের নয়, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফল যে আধুনিক শহর তিনি তার কবি, কারণ বর্তমান সভ্যতার বিষণ্ণ বন্ধ্যাত্বের কবি।' এত সব কিছু নিয়ে, আরও নানা ভাবসম্পন্ন কবিতা 'ন াগরিক।'

'নাগরিক' কবিতায় প্রথম আট পংক্তিতেই কবির ঘোষণায় আধুনিক জীবনের নাগরকেন্দ্রিকতার ছবি, ক্লেদ গ্লানি অন্ধকার পেষণ দুঃস্বপ্ন। তবুও এর মধ্যে রয়েছে অন্য অনুভব ; তিনি লিখেছেন,
মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি।
আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
দুঃস্বপ্ন।
এখানে 'আলকাতরার মতো রাত্রি' ---রাতের অন্ধকারের আস্তরণকে, সমাজটার অন্ধকার পথকে বোঝানো হচ্ছে। 'মহ ানগরীতে এল বিবর্ণ দিন' ---এখানে 'বিবর্ণ' শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, এখানে আকাঙ্খিত কিছু নেই, সাফল্য নেই। দিনে যে রোলার পথ তৈরি করছে, গলানো পিচের গন্ধ আতুর করছে বাতাস, পরিপার্শ্ব, রাতের তাই -ই অ ালকাতরার রঙে, স্বরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর রোলারের মুখর দুঃস্বপ্ন ---এখানে 'দুঃস্বপ্ন' কার্যত আনাকাঙ্খিত, এই যে দুঃস্বপ্নের শহর, এ কী কবির কাঙ্খিত ? নয়, কখনোই নয়। তাহলে এ যদি দুঃস্বপ্ন হয়, না - চাওয়া হয়, তবে কী চাই, তা দেখব পরবর্তী স্তবকে ; তারো আগে, 'দূরে, বহুদরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক' নিয়ে আসছে সাঁওতাল পরগনার অনুষঙ্গ, সাঁওতালি জীবনের অনুষঙ্গ। বিষ্ণু দে'র যেমন রিখিয়া, সমর সেনের তেমনই সাঁওতাল পরগণা। 'কৃষ্ণচূড়ার ল াল' ---এখানে নিছক ফুলের রঙের উল্লেখ নয়, হয়তো বা, কেননা নিশ্চিত নয়, হয়তো বা বিপ্লবের লাল পতাকা, প্রত্যাশ ার, পরিবর্তনের, দূরে, খুব দূরে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মাত্র হয়ে আছে। কোনো এক কাব্যবোদ্ধা ভাবতে চেয়েছেন এভাবে, 'আলক াতরার মতো রাত্রি, গলানো পিচের গন্ধ, পাথরের উপর রোলারের শব্দ বর্তমান যুগের দুঃস্বপ্নমুখর যন্ত্রণাকাতর বিরস জীবনকে রূপায়িত করছে, যদিও বহুদূরে কৃষ্ণচুড়ার লাল চকিত ঝলকশ্বাসরোধকারী অন্ধকারে সামান্য একটু আশাভরস ার আমেজ নিয়ে আসে।' (বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা।

কিন্তু নাগরিক জীবনের শেষ তো এখানেই নয়, মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি আতিক্রম করছে পথ, 'সোনালী সাপের মতো'। গ্রীক প্রতীকে সোনালী সাপ বা Golden Snake মৃত্যুকে অতিক্রম করে, এখানে এ যেন অন্য শহরের বক্র পথকে অতিক্রম করছে, কিন্তু উপনিবেশের শোষণশাসন তো ভুলে যাওয়া কবির পক্ষে সম্ভব নয়। এই সূত্রে কবির মনেহচ্ছে 'পাটের কলের উপরে আকাশ তখন / পাথরের মতো কঠিন' ---অর্থাৎ পুঁজির দাপটে সোনার অবস্থা যেখানেতৈরি হচ্ছে, পাট তে া সোনা, কিন্তু শহরস্থিত বা শহর - সংলগ্ন মানুষের সেখানে স্বাধীনতা নেই, সহজ সুযোগ নেই জীবনধারণের, তার কাছে আকাশ তখন পাথরের মতো কঠিন অর্থাৎ কঠিন অবস্থায় সে, তার শ্রেণিও। কিন্তু এখানেই থেমে থাকা নয়, ভাবনায় কেবলই এ ধূসরতা আর অন্ধকার নয়, কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না 'দুধারে গাছেরসবুজ বন্যা, / মাঝখানে গেয়া পথ' --- অর্থাৎ কতির বিবেচনায় এইটেই তো হওয়ার কথা, শ্রমিকশ্রেণির বলি, মধ্য শ্রেণির বলি, যথার্থ জীবনের অন্তঃসার বুঝে নিয়ে প্রত্যাশিতের ক্ষেত্রে ধরা পড়া উচিত এই অভিজ্ঞ অনুভূতি,সবুজ গাছের বন্যা, যা প্রাণবান ; গেয়া পথ অর্থাৎ ঐ প্রকৃতিবেষ্টিত সাঁওতাল পরগনার অবাধ চলার পথ, জীবন। একদিকে কংক্রিটের পথে নজর, নিষ্পেষিত গ্লানিকর নগরজীবনের দিকে দৃষ্টি অন্যদিকে প্রকৃতিতে টেনে আনা, 'দূরে সূর্য অস্ত গেল ; / ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে, চারদিকে অন্ধকার -- রাত্রের ঝাপসা গন্ধ ; ভরাচাঁদ ও অন্ধকার -- এই বৈপরীত্যের মিশেলে জীবনের আলো আঁধারি, সময়ের

সহজ - জটিল মায়াবাস্তবের ইঙ্গিত। কিন্তু সমর সেন এইখানে অনন্য, তারপর তিনি লেখেন---
কিছুক্ষণ পর হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূরে সমুদ্রের কোনো দ্বীপ থেকে
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধোঁয়াটে সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত ।
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন---
এখানে অদ্ভুত ভাবে ধনতান্ত্রিক শহরের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক শহরের স্বপ্ন ফুটে উঠে ; এ দেখায় জীবনকে ধিক্কার নেই, বরং যে-জীবনে আছেন তা থেকে অন্য এক জীবন খুঁজে পাবার স্বপ্ন আছে। বিবর্ণ দিন আর আলকাতরার মতো রাত্রি পেরিয়ে সমুদ্রের স্বপ্ন ---সবুজ সমুদ্রের স্বপ্ন ; দ্বীপমালা, আকাশ, সূর্যোদয় - সূর্যাস্ত হাওয়ার জোয়ার থাকছে।আর লাল সূর্যাস্ত -- সমস্ত দিন ; সূর্যাস্ত, সারাদিন থাকে না বা হয় না, কিন্তু ঐ 'লাল' সমসমাজের স্বপ্নময়তার প্রবলতা লাভ করে, শ্রমজীবী বলিষ্ট মানুষ উল্লেখিত হয় এবং 'স্পন্দমান স্বপ্নে'র উচচারণ শোনা যায়, অর্থাৎ পরিবর্তিতসমাজের, উন্নততর সমাজের স্বপ্নে স্পন্দিত হওয়া। 'নাগরিক' কবিতা তাই নিছক ক্ষয় বা অন্ধকারের দৃশ্যায়নে লগ্ন হয়ে ওঠে সৃজন নয়।

কিন্তু একটি স্পেসের পরেই তিনি লিখছেন, 'যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য। পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।' অর্থাৎ তিনি ফিরে আসছেন বর্তমান, তাঁর সমকালে, সমকালীন নগরজীবনে, যেখানে ইঁটের অরণ্য আর পথ চলায়, পথচলার শেষে কান্নার শব্দ, অর্থাৎ যন্ত্রণার শব্দ, অপ্রাপ্তিজনিত স্বপ্নভঙ্গের শব্দ এই কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্য আমরা একটু পরেও লক্ষ করব। আরো লক্ষ করব, রবীন্দ্রনাথকে তিনি কখনো নিজের আধুনিকতায়, চমৎকার কৌতুকে, কখনো ব্যঙ্গের মোড়কে ব্যবহার করেছেন।

'ইঁটের অরণ্য' বা 'কান্নার শব্দ' -ই যে শেষ কথা নয়, বাস্তব, কিন্তু তা যে সর্বস্ব নয় এমন একটা বোধ কাজ করেছে তাঁর মনে। তিনি লেখেন ---
ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী !
দ্বশ্বাস রাত্রি শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা
সমাজ জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন
আবার, এর বিপ্রতীপে শহরের অন্ধকার ক্ষয়িত, অপচয়িত দৃশ্যের বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না,

আর কত লাল শাড়ি নরম বুক আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ
হে মহানগরী !

লক্ষণীয়, কবি যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে 'ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়' তখন মহানগরী জেগে ওঠার দাবিতে সোচচার হতে বলছেন, এখানে এক ধরনের দৃপ্ততা ফুটে ওঠে, প্রচলিতের তথাকথিত স্থিতাবস্থার জগদ্দল পাথর ভেঙে, দ্বশ্বাস রাত পার হয়ে, সমাজরূপান্তরের, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আকাঙ্খায় কবি অকপট হয়ে ওঠেন, সমাজ জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্নে। কিন্তু বিভ্রান্ত করতে, ভোগবিলাসিতার তাৎক্ষণিকতায় প্রলুব্ধ করতে পণ্য শহরের এজেন্ট ও গণিকার আসর বসে ; 'লাল শাড়ি আর নরম বুক আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ' তৎপর হয়ে ওঠে। এরই প্রতিত্রিয়ায় গনোরিয়া আর বসন্ত, যা পরবর্তী পংক্তিগুলিতে আছে. কলেরা আর কলের বাঁশির ভবিতব্যতাও এখানে অনিবার্য সূত্রে উল্লেখিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কতিবতা' বা লিপিকা'র অংশ তুলে কৌতুকে ও শব্দের নব অর্থবহতায় শহরজীবনের কেরানি জীবনের ছবি আঁকায় বিশ শতকের মধ্য তিরিশ দশকের কলকাতাকে বোঝাতে চান --

যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে---
স্কুল আর কলেজ হল শেষ, ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে
সন্ধ্যা নামল ;
এখানে প্রথম ও শেষ পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ, মধ্য পর্যায়ে ব্যস্ত শহরের শু ও শেষের ছবি, আর সন্ধ্যার পরে---

মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
অমৃতের পুত্রদের কাছে যে আহ্বান, বন্যা - দুর্ভিক্ষ, কলেরা - কলের বাঁশি, গনোরিয়া - বসন্ত মনে রেখেই আহ্বান 'কখন সূর্য উঠবে --- এই আকাঙ্খায় কবি এত আন্তরিক হয়ে যেমন দিগন্ত দেখেন তেমনি চিৎপুরে বেশ্যালয়ে ভিড় লক্ষকরেন। আসলে ঘুরে ঘুরে কলকাতা শহরের বিকৃতির অংশটা, ব্যর্থতা ও গ্লানির চিত্রটা মনে করিয়ে দেন। অবশ্য বুদ্ধেদেব বলছেন, 'এই কথাগুলিতে আছে শহরের উচ্ছৃঙ্খল তোলপাড়ের প্রতিধবনি ; আছে ব্যঙ্গ ও বিক্ষোভ, আছে নীরক্ত ম ানুষের ক্লান্তি ; আর আছে দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদের ইঙ্গিত -- সেটাও আগ্রাহ্য নয়। কিন্তু এহ বাহ্য বলা যায় কী যখন ---
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক
আর ঝাপসা ভাবে শুধু অনুভব করি
চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।
এখানে 'ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ' বলার মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের কবি বলে একপক্ষের কাছে চিহিত সমর সেন কোনো সমাজ বিপ্লবের প্রতীক্ষায়, চমৎকার স্বপ্ন সম্ভাবনায় স্থিত হয়েছেন।

লক্ষণীয়, এই সময়কালে সমাজ ও রাষ্ট্রে, শহরে, শহর কলকাতায় অজস্র বৈপ্লবিক আন্দোলন, গণবিক্ষোভ ঘটে গেছে। কবিতায় তার আঁচ পাওয়া যায় না। আবার তাঁকে নিছক শহরের কবি বলে অভিহিত করতে আপত্তি জানান তণ সান্যাল। কেননা শহরের কথায় ঘটনায় নাগরিক ইমেজ রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁর ভেতরের টান শহরে আবদ্ধ নয়, তা সাঁওতাল পরগনায়, তার প্রকৃতিতে, তার লোকায়ত আরণ্যকতায়। শহরের কবিকে সমুদ্র দেখতে হলে দীঘায়যেতে হয় না, সতীন্দ্রন াথ মৈত্র বর্ষাকালের ঠনঠনের প্লাবিত কলকাতায় সমুদ্র দেখতে পান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সেভাবেই দেখেছেন, নাগরিক কবিকে এভাবেই দেখতে হয়। তণ সান্যালের এ অভিমতে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু অন্তঃসার অস্বীকার করতে পারি না।

সমর সেনের বহু কবিতার নামকরণ করেছেন চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। এ কবিতার নামকরণ ধরে নিতে পারি সমর সেনের অথবা অন্য কারোর। কিন্তু একী শুধু নাগরিকের চোখে দেখা নগরজীবনের বিবরণ বলেই নাগরিক 'তাৎপর্যপূর্ণ ? নাকি, অন্য কিছু ? সমর সেন জানতেন, যা আজ আরো বেশি বেশি লক্ষণীয়, নগর কলকাতায় দুধরনের মানুষ আছে, একদল ব াইরে থেকে সকালে আসে, বিকালে চলে যায়। অন্য ধরনের মানুষ নগরেরই অধিবাসী। ফলে 'নাগরিক' তাৎপর্যের বিস্তার বোধ করলে এমন ভাবনা অনর্থক নয়। অথচ তাঁর 'নাগরিক' কবিতাকে খাঁটি 'নাগরিক' কবিতা বলা যায়। সেখানে এরকম নগর ও নগর বৃত্তের বাইরের টানাপোড়েন নেই, সেখানে যন্ত্রণার ছবি অন্যরকম। তিনি লিখছেন, 'যে পথে নিঃশব্দ অন্ধক ার ঘটেছে ঘন হয়ে / ক্লান্ত স্তব্ধতার মতো,/ সে পথে দক্ষিণ বৃত হঠাৎ হাহাকার এল। শীতের আকাশে তীক্ষ্ণতায় তার

াগুলি আঁকা / হঠাৎ চাঁদ উঠে এল / কঠিন পায়ে ; / কালো পাথরের মতো মসৃণ শরীর, / মেয়েটি চোখ মেলল বাইরের আকাশে ---/ সে চোখে নেই নীলার আভাস নেই সমুদ্রের গভীরতা / শুধু কিসের ক্ষুধার্ত, কঠিন ইশারা, / কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে।' 'নাগরিকা'র তীব্র সংহতি, অন্যমাত্রায় বিস্তারিত 'নাগরিক'-এ। সেখানে বলার কথা অনেক, ব্যক্তিস্বর রূপে আর সমাজবীক্ষায়। নাগরিকের চোখে দেখা হোকবা নাগরিক জীবন নিয়ে হোক বা কোনো নাগরিক- সভ্যতা সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বা ভাবনা হোক --- নানা দিক থেকেই নাগরিক কবিতা অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সমর সেন প্রধানত গদ্য - ছন্দের কবি। 'নাগরিক' একটি খাঁটি গদ্য - ছন্দের কবিতা। তাঁর গদ্যছন্দ কারো অনুসারী নয় বলেই মনে করেন বুদ্ধদেব। 'তাঁর গদ্য - ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই কর া নয়।' পদ্য ছন্দের পরিবর্তে গদ্যছন্দে লেখার পরামর্শ তাঁকে বুদ্ধদেবই দিয়েছিলেন। অণ মিত্র তাঁর আলোচনায় জা নিয়েছেন, 'সমর সেন কাটা - কাটা শব্দে এবং খণ্ড খণ্ড প্রতীকী চিত্র ও বাঞ্জ্যনার আশ্রয়ে কবিতাকে একসংহত রূপ দিলেন এই ছন্দে যা তাঁর প্রধান প্রকাশ - পদ্ধতি হিসেবে বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত, শুধু বাক্যের প্রবহমানতা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল।' (কবি সমর সেন, অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮)। সমর সেনের কবিতা, সাধারণভাবে, ছোট ; 'চমকলাগা কাট াকাটা উচচারণ' ফলে শঙ্খ ঘোষ সমর সেনের গদ্যছন্দে নিজস্ব ধবনিরূপ গড়ে তোলালক্ষ করেছেন। মিশ্রবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত পুষ বা নিটোল গদ্য কবিতায় সমর সেন বিশিষ্ট। বিষ্ণু দে তাঁর গদ্য কবিতাকে হুইটম্যান বা লরেন্সমার্গী ভাবেন নি, পাউন্ডপন্থী বলেছেন। যদিও বিষ্ণু দে মন্তব্য করেন, 'সমর সেন আঙ্গিকের দিকথেকে আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই , গদ্যের নয়' ---হুইটম্যানের গদ্যপন্থী কবিতা বা পাউণ্ডের কবিতাপন্থী গদ্যকবিতার ব্যাখ্যা করে, লরেন্সচর্চা করেও শেষমেশ বিষ্ণু দে জানান, 'ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভ াষা প্রয়োগ তো ঢিলে হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষাব্যবহার ব্যঞ্জনায় তার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের ত াৎপর্যার্থে অখণ্ড।' (পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৪)। রবীন্দ্রনাথও যথার্থই ধরতে পেরেছিলেন 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে ক াব্যের লাবণ্য প্রকাশ।' ফলে তাঁর গদ্যছন্দে লেখাকবিতা নিছক বিবরণ নয়, সৃজনমহিমায় নন্দিত, নান্দনিক তাৎপর্যে মণ্ডিত। 'নাগরিক' কবিতার মধ্যেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। যেমন ---

১. দূরে বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ

২. দুধারে গাছের সবুজ বন্যা
মাঝখাপে গেয়া পথ

দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে

৩. যত দূর চাই ইঁটের অরণ্য
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

৪. জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা
সমাজ জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন

৫. যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
স্কুল আর কলেজ হল শেষ, ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন

দশটা পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে
সন্ধ্যা নামল।

৬. মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !

৭. রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হওয়ার চাবুক

আসলে, সমগ্র কবিতায়ই গদ্যছন্দের অনবদ্য প্রয়োগ সাফল্য ঘটেছে, আমরা কিছুমাত্র উল্লেখ করেছি। 'রাবীন্দ্রিক কবিতারলথতাবর্জিত' বলেই হয়ত তাঁর গদ্যছন্দের সার্থক ব্যবহার স্বীকার করে নিয়ে একালের সমালোচকের মনে হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা যে কারণে খানিকটা দিগ্ ভ্রষ্ট, তারই বিপরীত কারণে সমর সেনের সাফল্য স্বাভাবিক।' এক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি মনে হলেও সমর সেনের গদ্যকবিতায় গদ্যছন্দের শক্তিমত্তার প্রকাশকে কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি জানাতে হয়।

জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন উপমাই কবিত্ব'। সমর সেন করিতার চিত্রকল্প বা কল্পবিম্ব, লক্ষভেদী শব্দ, উপমার ব্যবহারেও চমক জাগান। অভিনবত্বের বোধে পাঠককে বিস্মিত করেন। অতিত্রম করে', বা 'পাটের কলের উপরে আকাশ তখন / পাথরের মতো কঠিন' উল্লেখযোগ্য, কিংবা অলঙ্কারের নিরিখে 'হওয়ার চাবুক।'

গদ্যকবিতার অনবদ্য শিল্পী সমর সেন 'নাগরিক' জীবন বা নগর জীবন -- দুই-ই দেখেছেন নিজের মতন করে ; সেখানে রবীন্দ্রনাথ নেই, রবীন্দ্রনাথের কৌতুকময় ব্যঙ্গাত্মক বা তির্যক ব্যবহার আছে। সমকালীন কেউই তাঁকে প্রভাবিতকরতে পারেন নি। 'নাগরিক' কবিতাটি সামনে রেখে অণ মিত্রর কথাকে প্রাসঙ্গিক ভেবে মনে করা যায়, 'মধ্যবিত্ত নাগরিক অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ দৈনন্দিনতা তার সঙ্কীর্ণতা, আত্মপরায়ণতা এবং অসহায়তা সমর সেন তাঁর কবিজীবনে অচিরেই চিনে নিয়েছিলেন।' (কবি সমর সেন)। কবি তাঁর যন্ত্রণাকে জেনেছিলেন। বুঝেছিলেন মধ্যবিত্তেরসীমাবদ্ধতার গ্লানি, তবু 'সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আবাহনে অনুভবে' আস্থা পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর আততিতে নাগরিকতা ; তাঁর আততি তঁারই ছিল না ছিল সময়ের পর্ব পর্বান্তরের, এই যন্ত্রনা, এই আততি কেবল মানুষ কে ব্যক্তিকে ভাঙেনা, সমাজকে টুকরো করেনা, সমাজবদলের স্বপ্ন দেখায়। সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়েছিলেন, তিনি কবিতার সৃষ্টিতে স্থিত রইলেন না। পরবর্তীকালে অন্য ব্রতযাত্রায় তিনি প্রাণিত হলেন, তাও অনন্য। 'নাগরিক' কবিতার শেষে তিনি যে লিখেছিলেন, 'মাঝে মাঝে আকাশে শুনি / হাওয়ার চাবুক / আর ঝাপসা ভাবে শুধু অনুভব করি / চার দিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণ' শঙ্খ ঘোষ তা মনে রেখেই যে কথা বলেছিলেন, তা থেকেও নাগরিককবিতার ঐতিহাসিক, সাহিত্যগত ও বীক্ষাগত তৎপর্যের গভীরতা বুঝতে কষ্ট হয় না --'ঝড়ের যে নিঃশব্দ সঞ্চারণের কথা ছিল প্রথম কবিতার বইতে, শব্দের তীব্র আঘাতের যে প্রতীক্ষা ছিল, তার একটাসাময়িক আসন্নতা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চারপাশে, সত্তর দশকের উদ্‌বেলতায়। কবিতার জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরে গিয়ে এই উদ্‌বেলতার সঙ্গে যেভাবে নিজেকে তিনি মিলিয়ে ছিলেন, তাকেও বলা যায় এক সৃষ্টিরই জগৎ, সংঘাতের আন্দোলনের উদ্দীপনার সৃষ্টি।' (নিঃশব্দতার ছন্দ, অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮)।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com